গল্প, যুক্তি ও উদাহরণের সাহায্যে **ঈমান সিরিজ**

প্রিয়নবির পরিচয়

এবং

ফেরেশতা কারা

আব্দুল্লাহ আল নাবিল
সিদ্দিক স্বপন

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

ভূমিকা

আজকের শিশু-কিশোররা অনেক বেশি অগ্রসর। বিশ্বায়নের কারণে তারা এমন অনেক কিছু শিখছে, যা ওই বয়সে আমরা শিখতে পারিনি। এমন অনেক বিষয় নিয়ে তারা ভাবছে, ওদের বয়সে যা আমাদের মাথাতেই আসেনি। তারা এমন কিছু প্রশ্ন করে বসছে, যা হয়তো কখনোই আমাদের ভাবনায় নাড়া দেয়নি। শিশু-কিশোরদের এই অগ্রগামিতা একদিক থেকে যেমন প্রশান্তির, অন্যদিক থেকে তেমনি উদ্‌বেগের।

আপনি খেয়াল করলে দেখবেন, তাদের সামনে কোনো বিষয় অবতারণা করা হলে তারা বিনা প্রশ্নে তা মেনে নিচ্ছে না। এমনকি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়েও প্রশ্ন করতে ছাড় দিচ্ছে না।

শুনলাম ও মানলাম; এই উপদেশ যেন তাদের কাছে ফিকে বিষয়। এর পরিবর্তে তারা চায় যৌক্তিকভাবে মানতে, শুনতে। যেমন : আমরা যদি বলি, আল্লাহ এক। তারা পালটা প্রশ্ন করে—'আল্লাহ কেন এক?' যদি বলি ফেরেশতাদের কথা, তারা প্রশ্ন করে—'আমরা কেন ফেরেশতাদের দেখতে পাই না?' যদি বলি—মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই। সকল মানুষ সমান। তারা প্রশ্ন করে বসে—'তাহলে কেউ ধনী কেউ গরিব কেন হয়? কেন সাদা ও কালো বর্ণের এই রকমফের?'

এমন নানান প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হই আমরা। বিস্তর ধারণা না থাকায় হয়তো যৌক্তিক উত্তর দিতে পারি না। ফলে এর প্রভাব হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়ায় শিশুরা গোড়া থেকেই সংশয় ও সন্দেহ নিয়ে বেড়ে ওঠে। এতে প্রাপ্তবয়সে উপনীত হওয়ার পর সংশয়বাদিতায় ঝুঁকে যায় অনেকে। এমনকি ইসলামবিদ্বেষী মনোভাব দ্বারাও আক্রান্ত হয় কেউ কেউ।

কলিজার টুকরো সন্তানদের এমন ভয়াবহতা থেকে মুক্ত রাখতে তাদের হৃদয়ে উদ্ভূত প্রশ্নগুলোর যৌক্তিক উত্তর শৈশবেই সরবরাহ করতে হবে এবং এর ভাষা হবে তাদের উপযোগী।

আমাদের এই সিরিজটি ঈমানের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে শিশু-কিশোরমনে পুঞ্জীভূত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ। শিশু-কিশোররা হয়ে উঠবে একজন সংশয়মুক্ত সাচ্চা মুসলিম।

ঈমান সিরিজটি মোট চারটি খণ্ডে বিভক্ত—

১. এসো আল্লাহকে জানি

২. প্রিয়নবির পরিচয় এবং ফেরেশতা কারা

৩. কুরআন কী বলে

৪. পরকাল ও ভাগ্য কী

ঈমানে মুফাসসাল বা ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো এই সিরিজে অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। শিশু-কিশোররা এতে যেমন ঈমানের শিক্ষা পাবে, তেমনি পাবে সাহিত্যপাঠের অমিয় স্বাদ, যা তাদের পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

সূচিপত্র

জিয়নকাঠি	৯
যাত্রা শুরু	১৩
আঁধারময় পৃথিবী	১৭
একটি আলোর জন্ম	২০
আমরা কেন প্রিয় নবিজিকে ভালোবাসব	২৪
শিশুদের সাথে প্রিয় নবিজি	২৭
পশু-পাখিদের সাথে প্রিয় নবিজি	৩০
নবিজি সবাইকে ক্ষমা করে দিতেন	৩৩
নবিজির সময়ানুবর্তিতা	৩৬
নবিজি কি মজা করতেন	৩৯
অমুসলিমদের সাথে নবিজির আচরণ	৪১
বিদায় হজ	৪৪
খতমে নবুয়ত	৪৭

ফেরেশতা

ফেরেশতাদের ওপর বিশ্বাস কেন করতে হবে	৫১
ফেরেশতা আসলে কী	৫৫
আল্লাহ সকল কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম	৫৭
ফেরেশতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য	৬২
ফেরেশতারা কি আল্লাহর সাহায্যকারী	৭১
ফেরেশতাদের দেখা যায় না কেন	৭৪
হয়তো-বা ফেরেশতা বলতে কিছুই নেই	৭৮
ফেরেশতারা নারী নাকি পুরুষ	৮৩
মৃত্যুর ফেরেশতা আজরাইল ভালো না খারাপ	৮৬
মুনকার-নাকির আমাদের বন্ধু না শত্রু	৯৩
মানুষ শ্রেষ্ঠ নাকি ফেরেশতা	৯৭

জিয়নকাঠি

জিয়নকাঠি। ছোঁয়ালেই জেগে ওঠে সব। সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি অদলবদল করলেই গোলাপ ফুলের পাপড়ির মতো চোখের পাতাগুলো কাঁপতে কাঁপতে খুলে যায়। বিরাট দিঘি। থইথই করে পানি। তার মাঝখানটায় একটা সিন্দুক। তার ভেতর সোনার কৌটা। তারও ভেতর আছে ভোমরা। কুচকুচে কালো ভোমরা। নিশ্বাস বন্ধ করে এক ডুবে আনতে হয় সোনার কৌটা। তারপর দুটি আঙুলের মাঝখানটায় এনে শক্ত করে একটা চাপ দিলেই সব শেষ। দৈত্য-দানবেরা মরে যায়। রাক্ষস-খোক্ষসরা ভয়ে পালায়। নিঝুমপুরী গমগম করে। নহবতখানায় আবার নহবত বাজে। ঘোড়াশালে জাগে ঘোড়া। হাতিশালে হাতি। আরও জাগে পাখপাখালি, গাছের ডালে ডালে।

ফুলে ফুলে প্রজাপতি। লাল-নীল-হলুদ। নিঝুমপুরীতে আলো জ্বলে। ঝলমল করে সব। ফকফক করে। সেখানে এখন হাসি আর হাসি। আলো আর আলো।

এমনি করে দিন যায়। মাস যায়। বছর চলে যায়। একদিন। নিঝুমপুরীর বাসিন্দারা বেখেয়াল হয় হাসতে হাসতে। আর রাক্ষস-খোক্ষসের ছেলেরা ভাবে, এই তো সুযোগ। এ সুযোগ হাতছাড়া করে না তারা। আবার আসে। নিঝুমপুরীর সব হাসি আবার থেমে যায়। আলো নিভে যায়। শুকসারি আর গান গায় না। পাখি নেই। প্রজাপতি নেই। খুশি নেই। আনন্দ নেই। সব উধাও হয় নিমিষে। সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি অদলবদল করে দেয় তারা আবার। আর অমনি সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। নিঝুমপুরী রাক্ষস-খোক্ষসের কবজায় চলে যায়।

দিন যায়। মাস যায়। বছর যায়। অনেক বছর। নিঝুমপুরী আর জাগে না। হাসে না। দৈত্য-দানো, রাক্ষস-খোক্ষসদের মনের ভেতর এখন খুশির ঢেউ। ওঠে আর নামে। তারা ধপধপ করে হাঁটে। মাটি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে হাঁটে। আনন্দে লুটোপুটি খায়। হইহুল্লোড় করে।

অনেক দিন পর। অনেক বছর পর। পক্ষীরাজে চড়ে আসে আরেক শাহজাদা। মেঘের পাহাড় ভেঙে ভেঙে। সাগর-নদী পার হয়ে। বন-জঙ্গল কেটে কেটে। নিঝুমপুরীর চূড়ায় এসে থামে তার পক্ষীরাজ। খাপ থেকে তলোয়ার খুলে নেয় শাহজাদা। ব্যাপার দেখে সরদার দৈত্যটার চোখ বড়ো হয়ে যায়। আর অন্য দৈত্যগুলো ভয়ে পুকুরের ঢেউয়ের মতো কাঁপতে থাকে। তবু শাহজাদার সাথে যুদ্ধ করে তারা। তুমুল যুদ্ধ। নিঝুমপুরীর দেওয়ালগুলো লাল হয়ে যায়। লালে লাল হয়ে যায় চত্বর। এক লন্ডভন্ড অবস্থা। শেষমেশ দৈত্য-দানোরা পালিয়ে যায় রণে ভঙ্গ

দিয়ে। দূরে বহুদূরে। নিঝুমপুরী আজাদ হয়। সোনার কাঠি-রুপোর কাঠি অদলবদল করে দেয় বীর শাহজাদা। আবার সবকিছু জেগে ওঠে। তারপর হাসি আর খুশির হুল্লোড়। সারা নিঝুমপুরীর শরীরজুড়ে স্বপ্ন আর স্বপ্ন!

তারপর? তারপর তো এ গল্পের শেষ। কিন্তু শেষ বললেই কি আর শেষ করা যায়। শেষেরও তো একটা রেশ থাকে। এখন সেই রেশের গল্প। এত সময় ইনিয়ে-বিনিয়ে যা বলা হলো, তা তো রূপকথার কাহিনি। কল্পনার পলকে উড়াল দিয়ে আকাশের নীলে হারিয়ে যাওয়ার কাহিনি।

এখন বাস্তবের দিকে চোখ ফেরানো যাক। আকাশের নীল থেকে একেবারে আমাদের এই সবুজ পৃথিবীতে। এখানে আছে মানুষ, পশু-পাখি, লতাপাতা, গাছ-বৃক্ষ, নদী-সাগর, আরও কত কী! তাই তাদের নিয়ে আছে কত গল্প, কত কাহিনি। কখনো গা হিম করা, আবার কখনো খুশির ঝিলিক দেওয়া। বিশেষ করে আমাদের মতো মানুষদের নিয়ে কত গল্পই-না ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এখানে-সেখানে! শুনলে মনে হয়, এও এক রূপকথার কাহিনি। আসলে এর সব কটাই কিন্তু বাস্তবে ঘটে যাওয়া ঝলমলে সত্য। এগুলো বাস্তবেরই গল্প। মানুষের গল্প। এই দুনিয়ার গল্প।

আদম আলাইহিস সালাম ছিলেন এই দুনিয়ার প্রথম পুরুষ মানুষ। আর বিবি হাওয়া প্রথম নারী। এখন আমরা যারা দুনিয়ায় আছি, তারা সবাই তাঁদেরই ছেলেপুলে। মোটকথা, আদম আলাইহিস সালাম হলেন আমাদের সবার আদি পিতা। বিবি হাওয়া হলেন আদি মাতা। এজন্যই তাদের বলা হয় বাবা আদম আর বিবি হাওয়া। তাঁরা কী করে এই দুনিয়ায় এলেন, তা নিয়ে অনেক বড়ো গল্প আছে। তবে অল্প কথায় সে গল্প হলো, বাবা আদম ও মা হাওয়া আল্লাহর নিষেধ না শুনে গুনাহ করেছিলেন। অবশ্য ইবলিস অর্থাৎ শয়তানই তাঁদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে সে গুনাহের ফাঁদে ফেলেছিল। আর শয়তানের কাজ তো একটাই, মানুষকে ফাঁদে আটকে দেওয়া। গুনাহের দুর্গন্ধ শরীরে মেখে দেওয়া। তবে আল্লাহর কথা স্মরণে থাকলে শয়তান কিন্তু মানুষের কাছে ঘেঁষতেও ভয় পায়। আগেই বলেছি, আদম-হাওয়া আল্লাহর নিষেধ ভুলে গিয়েছিলেন।

তাই আল্লাহ তাঁদের দুজনকেই এই দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন বেহেশতের বাগান থেকে। এটা ছিল তাঁদের শাস্তি। আল্লাহর কথা না শুনলে শাস্তি তো হবেই। এ কথা তাঁরা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন। তাঁরা এ কথাও বুঝলেন, ইবলিসের সুন্দর কথায় বিশ্বাস করা ঠিক হয়নি। তাঁরা আল্লাহর কাছে মাফ চাইলেন। কান্নাকাটি করলেন। আল্লাহ তো দয়ার মহাসাগর। তিনি তাঁদের অপরাধ মাফ করে দিলেন। তখন তাঁরা ঘর-সংসার শুরু করলেন এই দুনিয়ায়।

এক-দুই-তিন করে মানুষ বাড়ে। সংসার বাড়ে। সাথে বাড়ে মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধিও। বাড়ে মনের ভেতর আল্লাহর ভয়। শাস্তির ভয়। এ ভয়ই তাদের ফুলের পাপড়ি বিছানো পথে চালায়। আল্লাহর কাছাকাছি থাকতে শেখায়। সত্যের পাশাপাশি হাঁটতে শেখায়। তাদের মনে হুহু করে সুখ-শান্তির ঠান্ডা বাতাস। হাসি-খুশির লাল-নীল প্রজাপতি। এ প্রজাপতি উড়তে উড়তে একদিন থেমে যায়। কারণ, ঝিমিয়ে পড়ে বাতাস। বেশি বেশি হাসি আর আনন্দের কালো পলি ঢেকে ফেলে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ। আদমসন্তানরা ভুলে যায় শাস্তির কথা। গুনাহের পরিণতির কথা। তার সৃষ্টিকর্তার কথা।

রূপকথার সেই নিঝুমপুরীর মানুষজনদের মতো তারা বেখেয়াল হয়। বেপথ হয়। আসলে সব কাজেরই তো একটা সীমা আছে। দেওয়াল আছে। এ দেওয়াল ডিঙালেই বিপদ। বেখেয়াল হলেই বিপদ। থ্যাঁতলে যায় বুক, পাঁজর। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। কষ্ট হয় চলতে-ফিরতে।

নিঝুমপুরীর মানুষজনেরা হাসতে হাসতে বেখেয়াল হয়েছিল। এই সুযোগ দৈত্য-দানোরা হাতছাড়া করেনি। তারা হইহই করে এসে পুরী দখলে নিয়েছিল। আদম-হাওয়ার সন্তানদের বেলায়ও একই অবস্থা। যেই তারা বেখেয়াল হয়, অমনি ইবলিস তার কাজে লেগে যায়। চোখের সামনে টাঙিয়ে দেয় লোভ-লালসার রঙিন পোস্টার। আরও কত কথার স্বপ্নীল মিছিল! মানুষ তখন ইবলিসের পেছন পেছন হাঁটে। বসে, ঘুমায়। তাদের চোখে তখন লোভ-লালসার স্বপ্ন।

এ-ই তাঁদের কাল হয়। কাল হয় ইবলিস আর ইবলিসের সাঙ্গোপাঙ্গদের। মানুষের চারপাশে অন্ধকারের বিশাল পাহাড়-পর্বত। অসত্য আর অন্যায়ের বিরাট দিঘি। এসব দিঘিতে তারা হাবুডুবু খায়। অন্ধকারে হাঁটতে গিয়ে পা ভাঙে, হাত ভাঙে। স্বস্তি নেই। শান্তি নেই।

আল্লাহ তো দয়ার মহাসাগর। রহমতের শীতল ঝরনা। মানুষের এ উলটপালট অবস্থায় তাঁর দুঃখ হয়। কষ্ট হয়। তিনি উদ্ধারকারী পাঠান। তাঁরা আসে একের পর এক। শত শত বছর পর তাঁরা আসেন। আসেন হাজার হাজার বছর পরেও। এ দেশে-সে দেশে তাঁরা আসেন। একালে-সেকালে তাঁরা আসেন। তাঁরা বুকের ভেতর লুকিয়ে নিয়ে আসেন আল্লাহর কথা। আল্লাহর আদেশ-নিষেধের কথা। ভালো-মন্দের কথা। সাথে তাঁদের আলোর বড়োসড়ো গোলক। যে গোলকের আলো অন্ধকার সাফ করে। গুনাহের ধূলিঝড়ে আটকে পড়া মানুষেরা আবার আলোর পথে আসে। মনের নরম ঘরটায় আল্লাহর কথাকে পুঁতে নেয়। ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনা করে, মাফ চায়। ইবলিস তখন বেদিশা হয়। তার মনের খুশি থেমে যায়।

এভাবে এসেছেন আল্লাহর উদ্ধারকারী দল। নবি-রাসূলগণ। তাঁরা পথহারা মানুষকে পথের দিশা দিয়েছেন। শেষবারের মতো আল্লাহ যাকে পাঠিয়েছিলেন, তিনি আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি কালোয় ঢাকা দুনিয়াকে আলোতে এনেছিলেন। ইবলিসের টাঙানো লোভ-লালসার পোস্টারগুলো ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। তাঁর ঘোড়ার খুরের আঘাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গিয়েছিল অসত্যের খসখসে শরীর।

আমরা এবার আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে জানব। চলো, তবে দুনিয়ার সবচেয়ে মহৎপ্রাণ আমাদের নবিজির সম্পর্কে জানার যাত্রা শুরু করি।

যাত্রা শুরু

মায়ের গর্ভে বেড়ে উঠতে শুরু করে একজন মানবশিশু। ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই সে চারপাশের একটা সম্পূর্ণ তৈরি জগৎ অনুভব করে। তার শরীরের শক্তি, খাদ্য ও অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। এ দুটোই সে জন্মানোর আগেই মায়ের নাড়ির মাধ্যমে পেতে শুরু করে। এসব ঘটে দু-চোখ দিয়ে পৃথিবীর আলো দেখার আগেই।

এরপর সে চোখ মেলে পৃথিবীর আলো দেখতে পায়। আর তখনই সম্পূর্ণ প্রস্তুত ও সুসজ্জিত এক বিশ্বজগৎ সে আবিষ্কার করে। ঠিক যেন তারই জন্য, তার উপযোগী এক জগৎ। একে একে সে পুরো পৃথিবীকে দেখতে শুরু করে। দিনের আলোয় তার মায়ের মায়াভরা মুখ সর্বপ্রথম দেখতে পায়। আর সে আলোর জন্য পুব আকাশে উত্তাপ ছড়াচ্ছে একটা আস্ত নক্ষত্র। যেন সূর্য নামক নক্ষত্রটি এত দিন ধরে তারই অপেক্ষা করছিল।

সে যখন রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, তখন স্নিগ্ধময় চাঁদ তার দিকে আলোর ঝরনাধারা বইয়ে দেয়। মনে হয় চারিদিক উথালপাথাল করে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে তার স্নিগ্ধতা ঝরছে। হাজারো তারার প্রদীপ তখন তাকে ঘিরে হাসতে থাকে মিটিমিটি। আঁকাবাঁকা পথ ধরে ছোট্ট নদীটাও একটা সময় ফুলেফেঁপে সমুদ্রে ডুব দেয়।

কত রঙের মাছ যে সেই অতল গভীরে খেলা করছে, তার হিসাব রাখা কঠিন। অতল গভীরে প্রতিনিয়ত অক্সিজেন আসছে কীভাবে, তাও এক বিস্ময়। অসীম নীলের সমাহার সমুদ্রের অসংখ্য জলরাশি যেন ছেয়ে আছে পুরো পৃথিবীকে। সাথে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল আর বিশাল দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের বাড়ির কাছের বা দূরের গাছগুলো তো ঢাল হিসেবে আছেই।

এসবের ভিড়ে মানবশিশুটা আস্তে আস্তে বড়ো হতে থাকে। এরপর একটা সময় সে চিন্তা করতে শুরু করে। অবাক হয়ে ভাবতে থাকে তার এই ‘সব পেয়েছি’ জীবনের কথা। ভাবতে থাকে কীভাবে জন্ম নেওয়ার পূর্বেই তার জন্য প্রস্তুত একটা বিশ্বজগৎ সে পেয়ে গেল। তার আগে জন্মানো মানুষগুলো নিশ্চয়ই এটা তৈরি করেনি।

বরং তারাও জন্মের সাথে সাথেই ঠিক একই রকম ‘প্রস্তুত’ দুনিয়া পেয়েছে। তাহলে কীভাবে এসব তৈরি হলো? আপনা-আপনি তৈরি হলে তো সেখানে প্রয়োজনীয় সবকিছু একবারে থাকার কথা ছিল না। তার মানে এই বিশ্বজগৎ কেউ না কেউ চিন্তাভাবনা করেই বানিয়েছে।

মাথায় প্রশ্ন জাগে, আচ্ছা যিনি এসব বানিয়েছেন, বানানোর সময় কেউ কি একটু-আধটু সাহায্য করেছে? নাকি তিনি একাই বানিয়েছেন?

এমন হাজারো প্রশ্ন তার মাথায় অবিরত ঘুরতে থাকে। সত্যিকার অর্থে এমন মানবশিশু আসলে সবাই। আমরা সবাই একইভাবে চিন্তা করি। কেউ হয়তো উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি। আবার কেউ কেউ শুধু চিন্তা পর্যন্তই থেমে থাকে। উত্তর খোঁজার বিশেষ একটা আগ্রহ অনেকেরই নেই। সে যা-ই হোক, এসবের উত্তর আসলে মানুষের পক্ষে ব্যাখ্যা করা সম্ভব না। কেউ যে ব্যাখ্যা দেননি, বিষয়টা সে রকমও না। তবে সেই ব্যাখ্যাগুলোর সবই মানুষের ধারণা থেকে।

ব্যাখ্যাগুলো বাস্তব বা পুরোপুরি সঠিক না হওয়ার কারণ হলো, সেগুলো তো নিশ্চয়ই সেই ব্যাখ্যাকারী সৃষ্টি করেননি। তাহলে কে এগুলো পুরোপুরি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে? আমরা কি সঠিক উত্তর কোনো দিনই জানব না?

স্বভাবতই এর উত্তর হলো, যিনি সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা এসব বলবেন। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা কি সরাসরি মানুষের সাথে কথা বলবেন? আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের উপায়টাই-বা কী? আমরা তাঁর কথা শুনবই-বা কীভাবে?

এসব চিন্তা করতে বেশ মজা লাগছে না?

এসব হাজারো চিন্তার সমাধান অবশেষে সৃষ্টিকর্তা নিজেই দিলেন। তিনি মানুষদের মধ্য থেকেই কিছু মানুষকে বাছাই করলেন। এই মানুষগুলোর জ্ঞান ও চারিত্রিক গুণাবলি অন্য সবার থেকে ভালো। তাঁদের কাছে সৃষ্টিকর্তা মানুষের প্রয়োজনীয় সব তথ্য প্রয়োজন অনুসারে পাঠাতে লাগলেন।

সেই মানুষগুলো তাঁদের জাতির কাছে সৃষ্টিকর্তার মহান বাণীগুলো প্রচারের কাজে লেগে গেলেন। লোকেরা সেগুলো গ্রহণ করতেও শুরু করে। এভাবে করে যুগের পর যুগ পার হতে থাকে। একটা সময় পর মানুষ ভুলে যেতে শুরু করে সৃষ্টিকর্তার বাণীগুলো।

আমরা যখন কোনো কিছু ভুলে যাই, কেউ যদি তা স্মরণ করিয়ে দেয়, তাহলে তা আবার করা শুরু করি, তাই না?

তাই সৃষ্টিকর্তা তথা আল্লাহ সেই ভুলে যাওয়া জাতির লোকদের কাছে আবারও বার্তাবাহক পাঠালেন, লোকেরা আবারও আল্লাহর বাণীগুলো মেনে চলল।

এই পৃথিবীতে আল্লাহর অগণিত বার্তাবাহক এসেছেন। তাঁদের সবার কথাগুলো মূলত একই ছিল। সবাই বলতেন—'আমাদের সৃষ্টিকর্তা একজনই। আমাদের তাঁর কথা মেনে চলতে হবে। আর যারা তা মানবে, তারা মৃত্যুর পরে অনন্ত সুখের জীবন পাবে। যারা মানবে না, তারা মৃত্যুর পর অনেক কষ্টে থাকবে।'

এভাবেই একটা সময় মানুষদের কাছে নবি আসা শেষ হয়ে গেল। নবি আসা শেষ হলে পরবর্তী যুগের মানুষদের কী হবে, যদি তারা সৃষ্টিকর্তার বার্তা ভুলে যায়? এটা অনেক বড়ো একটা প্রশ্ন, তাই না?

এটার একটাই সমাধান। আর তা হলো—এমন একজন পরিপূর্ণ নবিকে সর্বশেষ নবি হিসেবে পাঠানো যার, উপদেশ সব যুগের সব মানুষের জন্য খাটবে। যার আদর্শ হবে পৃথিবীর আদি থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ। যার কথামালা চলবে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত।

তাহলে কে এই শেষ নবি? কী তাঁর পরিচয়? এটাই আমরা এই বইতে জানার চেষ্টা করব।

বরাবরের মতো এবারও মনোযোগ দিয়ে পুরো বইটি তোমাকে পড়তে হবে। এতে যেমন অনেক কিছু জানতে পারবে। শেখারও থাকবে অনেক কিছু। সেইসঙ্গে কার সাথে কীভাবে কথাবার্তা বলতে হবে, কীভাবে চললে আমরা ভালো মানুষ হিসেবে সবার কাছে দাম পাব—তাও জানতে পারবে।

চলো তাহলে, আমাদের জানার ও শেখার পর্বে ঢুকে যাই। একসাথে।

শেষ নবির ব্যাপারে আমরা জানব। তবে জানার আগে আল্লাহকে একটা ধন্যবাদ জানাতে আমরা যেন ভুলে না যাই। সেইসাথে শেষ নবির ওপর দরুদ। চলো তাহলে বলি, আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন। আস-সালাতু ওয়াস সালামু আলা সায়্যিদুল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহাবিহি আজমাইন।

আঁধারময় পৃথিবী

প্রিয়নবি সম্পর্কে ভালো করে জানতে হলে প্রথমে তাঁর জন্মের সময় এই পৃথিবীর অবস্থা কেমন ছিল, তা জানতে হবে। তিনি কোন পরিস্থিতিতে পৃথিবীতে এলেন সেটা বুঝতে হবে। বুঝতে হবে তাঁকে কেনই-বা এমন সময়ে পাঠানো হয়েছিল।

বিশ্বনবি জন্মের পর যখন তাঁর প্রথম পলক ফেললেন, সে সময় পৃথিবীজুড়ে ভয়ানক অবস্থা বিরাজ করছিল। তাঁর আগমনের সময়টিতে পৃথিবী খুব নাজুক ছিল। ঐতিহাসিকরা সেই সময় বোঝাতে আলাদা একটা শব্দ ব্যবহার করেন। ওই সময়কে বলা হয় 'আইয়ামে জাহেলিয়াত' অর্থাৎ অন্ধকার বা মূর্খতার যুগ।

মূর্খতার যুগ শব্দটা শুনে তুমি হয়তো ভাবছ—ওই সময়ের মানুষেরা লেখাপড়া, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদিতে পিছিয়ে ছিল। কিন্তু আসলে বিষয়টা তা নয়। তারা যে লেখাপড়া জানত না, এমনটা না। এই মূর্খতা হলো ন্যায়-অন্যায় আর সত্য-মিথ্যাকে না জানার মূর্খতা। সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে যাওয়ার মূর্খতা। নিজের রবকে ভুলে মূর্তিপূজা বা অগ্নিপূজার মূর্খতা।

চারদিকে তো জঘন্য অবস্থা বিরাজ করছিলই। তন্মধ্যে আরব দেশের অবস্থা ছিল সবচেয়ে শোচনীয়। কেমন শোচনীয়, তার সামান্য কিছু নিচে বলছি। পড়তে পড়তেই দেখবে গা কেমন শিউরে উঠছে!

ন্যায়-অন্যায়ের কোনো বালাই ছিল না সেখানে। চারদিকে নিরীহ দুর্বল মানুষেরা অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে আর্তনাদ করত। মেয়ে হলে তো কথাই নেই। হয় শিশুকালেই জীবন্ত অবস্থায় তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলা হতো। সমাজের হর্তাকর্তারা নিজেদের বিভিন্ন খারাপ কাজে তাদের ব্যবহার করত। খুন, ছিনতাই, লুটতরাজ ছিল নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার। যুদ্ধবিগ্রহ তো তাদের একদম স্বাভাবিক বিষয়। যুদ্ধবিগ্রহ যে তাদের কাছে কত স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছিল, তার একটি নমুনা তুমি দেখলেই বুঝতে পারবে।

একবার একজন ভিনদেশি লোক এক বৃদ্ধার বাড়িতে অতিথি হিসেবে যায়। তার সঙ্গে ছিল একটা উট। লোকটি উট চারণভূমিতে ছেড়ে দিয়ে বৃদ্ধার বাড়িতে খাবার খেতে বসে। এদিকে উটটা আরেক ব্যক্তির বাগানে প্রবেশ করে একটি গাছের সাথে গা ঘষতে থাকে। ওই গাছে ছিল একটি পাখির বাসা। উটের গা ঘষাতে পাখির বাসা থেকে একটি ডিম মাটিতে পড়ে ভেঙে যায়। এতে মা পাখিটি চ্যাঁচামেচি করতে শুরু করে। এতে ঘুম ভেঙে যায় বাগানের মালিক ব্যক্তিটির। সে অত্যন্ত রেগে যায়। রেগেমেগে উট ও পাখি উভয়কেই মেরে ফেলে।

এদিকে নিজের অতিথির উটের এমন অবস্থা দেখে বৃদ্ধাও প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তার অতিথির উট হত্যা করা হয়েছে, আর এতে তারও অপমান হয়েছে। বৃদ্ধা তাই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আত্মীয়স্বজনদের কাছে আকুতি জানাতে থাকে। বৃদ্ধার করুণ আর্তনাদে ব্যথিত হয়ে তার এক আত্মীয় সেই উট হত্যাকারীকে মেরে ফেলে। ফলে দুই পরিবারের মধ্যে মারাত্মক

যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আর সেই যুদ্ধ বংশানুক্রমে আশি বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। অর্থাৎ ৮০ বছর ধরে যুদ্ধ চলল শুধু একটি পাখির ডিম ভাঙার ঘটনাকে কেন্দ্র করে! কত তুচ্ছ বিষয়ে তারা মানুষ হত্যা করত! চিন্তা করো!

এ রকম আরেকটা যুদ্ধ হয়েছিল উকাজের মেলায় ঘটে যাওয়া একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ, যুদ্ধ ছিল তাদের জীবনযাপনের একটা খুব সাধারণ ব্যাপার।

তবে সবকিছু ছাপিয়ে একটি ভয়ানক পাপে লিপ্ত ছিল। তা হলো, এক আল্লাহর ইবাদত বাদ দিয়ে তারা অসংখ্য কাল্পনিক জিনিসের ইবাদত করত। সেগুলোর আবার মূর্তি বানিয়ে কাবাঘরে পর্যন্ত স্থাপন করেছিল। কাবা হলো আল্লাহর ঘর। সেখানে শুধু আল্লাহর ইবাদতই হওয়া উচিত। কিন্তু আরবরা কাবার ভেতরে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করেছিল। আর সেগুলোর পূজা করত। অন্যদিকে মদপান, জুয়ার আসর, জ্যোতিষচর্চা ইত্যাদি ছিল তাদের নিত্যনৈমিত্তিক কর্মকাণ্ড।

মানুষের জীবনের কোনো মূল্যই ছিল না তাদের কাছে। কাউকে ইচ্ছা করলেই হত্যা করে ফেলত। মানুষের জীবন যেন হাতের মোয়া। যে কারও সম্পদ মালিকের অনুমতি ছাড়াই নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করত। এতিম; যাদের বাবা-মা বা কোনো অভিভাবক ছিল না, তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়াকে নিজের অধিকার মনে করত। বাবা-মায়ের সম্পদে নারীদের কোনো অধিকারই ছিল না। পশু-পাখিদের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার, আর নির্যাতন চালাত। জীবিত পশুর শরীর থেকে মাংস কেটে সেগুলো রান্না করে খেত। কোনো নতুন সংবাদ দেওয়ার সময় পশুর নাক-কান কেটে হত্যা করা ছিল তাদের রীতি।

ভালো মানুষ যে তাদের মধ্যেও ছিল না, বিষয়টা এমনও নয়। শুধু এক আল্লাহর উপাসনা করত, এ রকমও কিছু মানুষ তাদের মধ্যেও ছিল। এদের হানিফ বলা হয়। আরবদের একটা ভালো গুণ ছিল। আর সেটা হলো অতিথিপরায়ণতা। হজযাত্রীদের তারা অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখত। তাদের সেবা করাকে তারা অত্যন্ত সম্মানের কাজ হিসেবে গণ্য করত। তারা কাব্যচর্চায় ছিল জগৎখ্যাত। এ রকম কিছু ভালো গুণাবলি তাদের মাঝে খুব অল্প হলেও বিদ্যমান ছিল।

তবে সব মিলিয়ে চারিদিকে ঘোর অন্ধকার গ্রাস করেছিল। সামান্য আলো সেই অন্ধকার ভেদ করতে পারেনি। কিন্তু সেই ঘোর অন্ধকার ভেদ করে মানুষের আর্তনাদ আর প্রার্থনা পৌঁছাল আরশে আজিমে। আরশে আজিমের মালিক মহান আল্লাহ; যিনি তাঁর সৃষ্ট মানুষের ওপর সবচেয়ে বেশি দয়ালু তাদের কথা শুনলেন। পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম সময়কে মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্টতম সময়ে পালটে দিলেন।

দয়াময় রবের সেই মহান করুণা যার হাত ধরে এই পৃথিবীতে এসেছিল, তিনি আর কেউ নন; আমাদের সকলের খুব প্রিয় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মানবতার জন্য যিনি মহান রবের কাছ থেকে এনেছিলেন সত্যের আলো, যার দ্বারা সমস্ত অন্ধকারের ওপর তিনি বিজয়ী হন আর মানুষকে শেখান কীসে আসবে শান্তি, কীসে আসবে সম্মান, কীসে আসবে মহান রবের আসল সন্তুষ্টি। মহান আল্লাহর কাছে আমরা দুআ করি, আল্লাহ তাঁর সম্মানকে আরও বাড়িয়ে দিন। আর আমাদেরও তাঁর যোগ্য অনুসারী হিসেবে কবুল করেন, আমিন!

একটি আলোর জন্ম

ভয়াল আঁধারের সেসব রাত অবশেষে শেষ হতে চলল। মানুষের আর্তনাদ অবশেষে শেষের মুখ দেখতে লাগল। আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল সালাত ও সালামে। একজন মহান সৃষ্টির সূচনা হলো। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ এই ধরাধামে এসে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হয়েছিল সে সময়ের মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ বংশ কুরাইশ বংশে।

কুরাইশ বংশের শ্রেষ্ঠত্বর মূল কারণ ছিল, তারা কাবাঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করত। নানা স্থান থেকে আগত হজযাত্রীদের সেবা করত। এই কাবার রক্ষণাবেক্ষণই তাদের সমগ্র আরবে মর্যাদার চূড়ান্তে পৌঁছে দেয়। মক্কায় তো বটেই, সমগ্র আরবজুড়েই তারা ছিলেন নেতৃস্থানীয়। এমন একটা সম্মানিত বংশে আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশব থেকেই ছিলেন এতিম। জন্মের কিছু মাস আগেই হয়ে পড়লেন পিতৃহীন। এমনকি যখন মাত্র ছয় বছর, তখন তাঁর মাও মারা যান।

দাদা আবদুল মুত্তালিব এবং তাঁর মৃত্যুর পর চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে তিনি বেড়ে ওঠেন। মাঝখানে আরবদের রীতি অনুয়ায়ী এক বেদুইন পরিবারে হালিমাতুস সাদিয়ার সান্নিধ্যেও ছিলেন কিছুকাল। সেই অন্ধকার যুগে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর স্বভাব-চরিত্র ছিল বিস্ময়করভাবে অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এমনকি নবি হিসেবে মনোনীত হওয়ার আগেও তিনি কখনো খারাপ কিংবা অশ্লীল কোনো কাজে জড়াননি।

বরং অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদিস থেকে জানা যায় যে, তাঁকে যখনই কোনো মন্দ কাজের দিকে তাঁর সঙ্গীসাথিরা ডাকত, তখনই কোনো এক অলৌকিক ঘটনা এমনভাবে ঘটত যে, তাঁর আর সেই খারাপ কাজগুলোতে যাওয়া হতো না।

একবার এমন হয়েছিল, কোনো একটা বিয়ের গানবাজনার আসরে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। হঠাৎ এক গাঢ় ঘুম তাঁকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যে, তিনি আর সামনের দিকে এগোতে পারেননি; বরং সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েন। আর পরদিন ভোরে গানবাজনার আসর শেষ হওয়ার পর তাঁর ঘুম ভাঙে। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন প্রচণ্ড রকমের লজ্জাশীল। তাঁর শৈশবে একবার কাবাঘর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অন্য শিশুদের সাথে তিনিও কাজ করছিলেন। অন্য শিশুরা পরনের কাপড় খুলে ফেলে কাজ করছিল কাজের সুবিধার্থে। তা দেখে তাঁর চাচা আবু তালিব তাঁকেও পরিহিত কাপড়টি খুলতে বললেন। কিন্তু চাচা যখনই সেটা খুলতে গেলেন, তখনই তিনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে আসার পর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, কেন তাঁর এই অবস্থা হয়েছিল? তিনি বললেন, অদৃশ্য থেকে তাঁকে কেউ যেন বলছিল—'হে মুহাম্মাদ! নিজেকে আবৃত করো।' এই অদৃশ্য আওয়াজ শুনেই তিনি অজ্ঞান হয়ে যান।

সে সময় মক্কায় যুদ্ধবিগ্রহ ছিল নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু এসব যুদ্ধবিগ্রহ তাঁকে মনঃপীড়া দিত ভয়াবহ রকমের। এগুলোতে তিনি অংশগ্রহণ করতে চাইতেন না বা করতেন না। মানুষের মাঝে

সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি ছড়ানোর জন্য তিনি তাঁর মতো সমভাবাসম্পন্ন মানুষদের নিয়ে হিলফুল ফুজুল নামে একটা সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর আরও একটা বিশেষ গুণ ছিল। আর সেই গুণটি হলো, সততা ও বিশ্বস্ততা। তাঁর সততা এতটাই প্রসিদ্ধ ছিল যে, আরবের লোকেরা তাঁকে আল আমিন বা অতি বিশ্বস্ত নামে ডাকত। এমনকি তিনি যখন নবি হিসেবে আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছিলেন, সে সময় তাঁর সবচেয়ে বড়ো শত্রুরাও তাঁর কাছে তাদের মূল্যবান সম্পদ আমানত হিসেবে গচ্ছিত রাখত।

এ থেকেই প্রমাণিত হয়, তিনি কতটা সৎ আর বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের সাথে সব সময় ভালো ব্যবহার করতেন। কখনো মন্দ কথা তাঁর মুখ দিয়ে বের হতো না। সে সময়ের মানুষদের যেসব বৈশিষ্ট্য ছিল, যেমন : লুটপাট, নারীদের অসম্মান, অত্যাচার-নির্যাতন সবকিছু থেকেই তিনি ছিলেন মুক্ত ও পবিত্র। সে সময়ের কোনো পাপ তাঁকে স্পর্শ করেনি। এই ছিল নবুয়ত লাভের আগেই আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচিত্র। আর তাঁর ওপর কিছুদিন পরেই মহাবিশ্বের সবচেয়ে কঠিনতম দায়িত্ব অর্পণ হতে যাচ্ছে।

এরপরেই কিছুদিন পরেই এলো তাঁর জীবনের সেই বিশেষ মুহূর্তটি। আল্লাহ তাঁর নিজের বার্তা ভুল পথে চলা মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁকে মনোনীত করলেন। তাঁকে নবি বা রাসূল বা বার্তাবাহক হিসেবে বেছে নিলেন মহান আল্লাহ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ নবিদের কাতারে শামিল করে নেন, যখন তাঁর বয়স ৪০ বছর। নবি হিসেবে তিনি ২৩ বছর বেঁচে ছিলেন। এর ১৩ বছর মক্কায় এবং বাকি ১০ বছর মদিনায় অতিবাহিত করেন। তাঁর দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু ছিল এই মহাবিশ্বের সকল ক্ষমতা, সকল প্রশংসা, সকল উপাসনা ও সকল প্রার্থনা হবে শুধু এক আল্লাহর জন্যই।

তাঁর দাওয়াতের আরেকটা মূল বিষয় ছিল। আর তা হলো, আমাদের এই পার্থিব জীবনটা শুধু অল্প কিছু সময়ের। এরপর আমাদের অসীম সময়ের একটা জীবন রয়েছে। আমরা যে যার কাজ ও বিশ্বাসের হিসেবে নিজেদের ফলাফল পাব। যে আল্লাহর কথামতো চলবে, সে ভালো পুরস্কার হিসেবে জান্নাত এবং যে আল্লাহর কথাকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজের মনমতো চলবে, সে শাস্তি হিসেবে জাহান্নাম পাবে।

তিনি মানুষকে বলতেন, তোমরা কাউকে ঠকাবে না। কাউকে মিথ্যা কথা বলবে না। কাউকে মন্দ নামে ডাকবে না। কন্যাশিশুদের মর্যাদা দেবে। মানুষকে ভালো কাজের কথা বলবে। খারাপ কাজ দেখলে বাধা দেবে। তিনি বলতেন—ধনী-গরিব, সাদা-কালো সব মানুষ সমান। মানুষের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যই হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এগুলোই ছিল তাঁর দাওয়াত। এগুলো তিনি আল্লাহর কাছ থেকে ওহি হিসেবে লাভ করতেন। কিন্তু আজকের সমাজের মতো সেই সমাজেও কিছু খারাপ ও মন্দ লোক তাঁকে বাধা দিতে থাকল। তারা অকথ্য ভাষায় গালি দিতে থাকল এই দয়ায় গড়া মানুষটিকে।

সেইসাথে চলল শারীরিকভাবে অসহনীয় নির্যাতন। কিন্তু মানুষের এসব নির্যাতন খুব ধৈর্যের সাথে অতিক্রম করে মানুষকে ভালোবাসা দিয়ে আল্লাহর পাঠানো বাণীগুলো পৌঁছে দিতে লাগলেন।

একসময় তাঁর শত্রুরা তাঁকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করল। আল্লাহর নির্দেশে তিনি মক্কা থেকে হিজরত করলেন মদিনায়। আস্তে আস্তে তাঁর সত্যের বাণী ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। দলে দলে লোক তাঁর সেই কথাগুলো গ্রহণ করতে লাগল। যারা এতদিন তাঁর ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালিয়েছে, তাদের ওপরেই তিনি বিজয়ী হলেন। কিন্তু তিনি যে দয়াময় পালনকর্তার পাঠানো সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, দয়ার নবি। তিনি সকলকে একবাক্যে ক্ষমা করে দিলেন। এজন্যই মহান আল্লাহ তাঁকে বলেছেন—

‘আর আপনাকে তো আমি পুরো মহাবিশ্বের জন্য দয়াস্বরূপ পাঠিয়েছি।’

আমরা হয়তো ঠিকভাবে বুঝতেও পারছি না, আমরা সেই সর্বশ্রেষ্ঠ নবির অনুসারী। আবারও তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম।